শুভ্র বরফের দেশ

ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা

অনুবাদ
মামুনুর রহমান

শুভ্র বরফের দেশ
ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা
অনুবাদ : মামুনুর রহমান

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য: ২৮৫ টাকা

Snow Country a novel by Yasunari Kawabata translated by Mamunur Rahman
Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Published: February 2023
Phone: 02223368736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bkash)
Price: 285 Taka RS: 285 US 12 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-97227-3-1

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উ ৎ স র্গ

প্রয়াত অধ্যাপক আবু তাহের মজুমদার স্যারকে

ভূমিকা

১.

সাহিত্যে এশিয়ার দ্বিতীয় নোবেলজয়ী ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা ১৮৯৯ সালে জাপানের ওসাকা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বলা যায় জন্মলগ্ন থেকেই দুর্ভাগ্যতাড়িত। শৈশব পার না হতেই পিতামাতা, বোনসহ আশ্রয় পাবার মতো প্রায় সবাইকে হারান। জাপানের পাবলিক স্কুলে লেখাপড়া শুরু। টোকিও ইমপেরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে প্রথমে ইংরেজি সাহিত্য, পরে বিষয় পরিবর্তন করে জাপানি সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেই সাহিত্যের প্রতি প্রবল আকর্ষণ দেখান, যার প্রমাণ মেলে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সাহিত্য ম্যাগাজিন প্রকাশনায় ভূমিকা রাখার মাধ্যমে। ঐ ম্যাগাজিনেই তাঁর প্রথম ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। লেখালেখির মাধ্যমে তিনি প্রভাবশালী সাহিত্যিকদের নজর কাড়েন। ১৯২৪ সালে কাওয়াবাতা এবং আরও কয়েকজন আগ্রহী যুবক মিলে একটি নতুন সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশ শুরু করেন, উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক পশ্চিমা সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে কাজ করার মাধ্যমে জাপানি সাহিত্যের আধুনিকায়ন করা।

চিলির পাবলো নেরুদা, মেক্সিকোর অক্টাভিয়া পাজের মতো তিনিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রভাবিত ছিলেন। যেহেতু কাওয়াবাতা এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেই এশিয়ার তথা পূর্বের বাসিন্দা ছিলেন এবং জাপানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দারুণ এক আত্মিক যোগ ছিল, কাজেই কাওয়াবাতা রবীন্দ্রনাথকে দেখেছিলেন এবং বুঝেছিলেন বেশ কাছ থেকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ১৯১৬ সালে জাপান ভ্রমণে যান, কাওয়াবাতা তখন স্কুলের ছাত্র। রবীন্দ্রনাথের কপালের দুপাশে ঝুলে থাকা পরিপাটি করা লম্বা সাদা ঝাঁকড়া চুল তার মনে দাগ কেটেছিল। রবীন্দ্রনাথকে দেখে 'প্রাচ্যের জাদুকর' বলে মনে হয়েছিল বলে তিনি তাঁর স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের মতো তাঁর লেখনীতেও প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দ্বৈততা, আধুনিক সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মনন সৃষ্টিতে পাশ্চাত্যের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়গুলো উঠে এসেছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মতো অতটা সমাজসচেতনতা তিনি দেখাননি, বরং তাঁর লেখাতে সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা নিয়ে এক ধরনের ভাববাদী মতাদর্শের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

সাহিত্যজগতে কাওয়াবাতার প্রবেশ ছোটগল্পের মাধ্যম। ১৯২১ সালে প্রথম ছোটগল্প প্রকাশিত হলেও ১৯২৬ সালে 'দ্য ড্যান্সিং গার্ল অব ইজু' প্রকাশিত হবার

মাধ্যমে লেখক হিসেবে সাহিত্যানুরাগীদের নজর কাড়েন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলো, যেমন *স্নো কান্ট্রি* (১৯৪৮), *থাউজ্যান্ড ক্রেন্স* (১৯৫৪,) *দ্য সাউন্ড অব দ্য মাউন্টেন* (১৯৫৪), *দ্য হাউজ অব দ্য স্লিপিং বিউটি* (১৯৬১) এবং *বিউটি অ্যান্ড স্যাডনেস* (১৯৬৫) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ও পরের সময়ে প্রকাশিত, তবে তাঁর লেখায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি বা সমসাময়িক ঘটনাবলির কোনো সুস্পষ্ট উল্লেখ বা উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না। বরং কাওয়াবাতার সাহিত্যচিন্তার একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল বহমান সময়ের প্রেক্ষাপটে এই পৃথিবীতে অথবা বিশ্বে মানুষের অবস্থান, পুরুষ ও নারীর অর্থবহ সম্পর্ক স্থাপনের ব্যর্থ প্রচেষ্টা, জীবনে সুখ ও আনন্দের ক্ষণস্থায়ীতা এবং চিরন্তন সৌন্দর্যের সঙ্গে বিষাদের অতি-ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ইত্যাদি।

পিতৃ বা মাতৃস্নেহ কাকে বলে তাঁর জানা ছিল না। একান্ত আপন বলতে কেউই বেঁচে না থাকায় হৃদয়ের কোমল অনুভূতি প্রকাশের যেন মানুষই তিনি খুঁজে পাননি। কাওয়াবাতার বয়স যখন বিশ, তখন একটা মেয়ের সঙ্গে মন দেয়া নেয়া চলছিল বলে জানা যায়। তবে মেয়েটা এক সন্ন্যাসী দ্বারা ধর্ষিত হবার পর তাদের সম্পর্কের ইতি ঘটে। এসব কারণেই কাওয়াবাতা ছিলেন প্রচণ্ড চাপা, অন্তর্মুখী স্বভাবের। জীবনের প্রথমদিকে কয়েকটা সাহিত্য সংগঠনে যোগ দিয়েছিলেন এবং তাঁর সময়ের অনেক লেখকের সঙ্গে যোগাযোগও ছিল। এমনকি কিছুটা সমাজ ও রাজনীতি সচেতনতাও দেখিয়েছিলেন। তবে শেষের দিকে এসে জনতার ভিড় থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন। ১৯৬৮ সালে নোবেল পুরুস্কারপ্রাপ্তি উপলক্ষ্যে দেয়া ভাষণে তিনি জাপানি ঐতিহ্যে সৌন্দর্যের সঙ্গে নির্জনতা ও বিষণ্নতার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন। শৈশব থেকেই একান্ত আপনজনদের মৃত্যু এত কাছ থেকে দেখেছেন যে পরবর্তীতে তার চিন্তাভাবনা এবং লেখালেখির একটা অংশ জুড়ে থাকে জীবন ও মৃত্যুর নৈকট্যের ধারণাটা। বিশেষ করে ১৯৭০ সালে তাঁর ঘনিষ্ঠ লেখকবন্ধু ইউকিও মিশিমার আত্মহত্যার পর তিনি মুষড়ে পড়েন। ১৯৭২ সালে আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

২.

সাহিত্যের একটি প্রধান শাখা হিসেবে উপন্যাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এর বাস্তবমুখিতা। উপন্যাস্যের আগে যে সাহিত্য ছিল সেটা মূলত রোম্যান্স ঘরানার, যেখানে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন বাস্তবতা মুখ্য না হয়ে বরং কল্পনার স্বপ্নজগতে বিচরণটাই মুখ্য ছিল। দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, কষ্ট, মানুষে মানুষে কোলাহল, মারামারি, স্বার্থের সংঘাত, নারী-পুরুষের প্রেম-ভালোবাসা—এরকম হাজারো জীবনঘনিষ্ঠ ঘটনার উপস্থিতি উপন্যাসের আবেদনকে বাস্তবসম্মত ও সার্বজনীন করে। মানুষ বাস্তবে যেমন, উপন্যাসের চরিত্রগুলোও তেমন। বাস্তবতা ও চরিত্রায়ণের নিরিখে ওপরের বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ সাহিত্যকর্মের উপস্থিতি জাপানেই প্রথম

দেখা যায়—মুরাসাকি সিকিবু (৯৭৩-১০২৫?) নামের এক মহিলা লেখক একাদশ শতাব্দীতে *দ্য টেল অব গেনজি* নামে যে কালজয়ী সাহিত্যকর্মের জন্ম দেন, চরিত্র চিত্রায়ণ, বিষয়বস্তু ও কাহিনি বিন্যাসের বিচারে সেটাকেই বিশ্বের প্রথম উপন্যাসের সম্মাননা দেয়া হয়।

তবে এর অর্থ এই নয় যে একাদশ শতক থেকে জাপানে উপন্যাসের ধারা বিরতিহীনভাবে চলে আসছিল, অথবা ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা সেই ধারারই সাক্ষাৎ সৃষ্টি। *দ্য টেল অব গেনজির* পর থেকে ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত সেই অর্থে জাপানে আর কোনো উপন্যাসের দেখা মেলেনি। বরং বলা যায়, জাপানে আধুনিক উপন্যাসের আবির্ভাব হলো পশ্চিমা প্রভাবের ফসল। ১৮৬৮ সাল থেকে জাপানে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটে যেটাকে 'মেইজি রেস্টরেশন' বলে, যখন থেকে দেশটির দুয়ার সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমাদের জন্য খুলে দেয়া হয়, উদ্দেশ্য ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে প্রযুক্তি, বাণিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি বিষয়ে ধারণা নিয়ে আধুনিক জাপানের গোড়াপত্তন করা। পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের পর জাপানি শিক্ষাব্যবস্থায় আসে আমূল পরিবর্তন, আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে উচ্চশিক্ষার পাঠ্যসূচিতে ইংরেজি এবং ইউরোপিয়ান সাহিত্য ও সমালোচনাতত্ত্ব পড়ানো শুরু হয়। এভাবে পশ্চিমা উপন্যাসের সঙ্গে শিক্ষিত জাপানিদের পরিচয় হয়। অনেকে প্রথমে অনুবাদ, পরে নিজেরাই লেখা শুরু করেন। ফলশ্রুতিতে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে ঝানু ঔপন্যাসিকদের আবির্ভাব হয়। তাঁরা ছিলেন পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত, পশ্চিমা ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাঁরা সাহিত্যে আধুনিক যুগের ব্যক্তিমানুষের সমস্যা, মনমানসিকতা ইত্যাদি বিষয়গুলো তুলে ধরেন। ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা এবং তাঁর পূর্বের অথবা সমসাময়িক দাজাই ওসামু, মোরি ওগাই, নাৎসুমে সৌসেকি, সীমাজাকি তোশো, এরা সবাই পশ্চিমাধারার শিক্ষার সংস্পর্শে এসেছিলেন, যার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সাহিত্য রচনা করে জাপানে আধুনিক সাহিত্যের সূচনা করেছিলেন। যেহেতু জাপান তখন একটা পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে যাচ্ছিল, তাঁদের লেখায় ঐতিহ্য ও আধুনিকতা, ধ্বংস ও গঠন, সন্দেহ ও আত্মবিশ্বাস, এসবের মধ্যে দ্বন্দ্বের বিষয়গুলো উঠে এসেছে।

সমসাময়িক পাশ্চাত্যের আধুনিক সাহিত্য ও শিল্প অনন্য হয়ে ওঠার একটা প্রধান কারণ সেখানে অভিনব ধ্যান-ধারণা, তত্ত্ব অথবা 'ইজম'-এর পরীক্ষা ও প্রয়োগের মাধ্যমে শিল্পসাহিত্যের অচলায়তন ভেঙে সেটাকে আধুনিক সমাজবাস্তবতার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ করার জোর প্রয়াস ছিল। আধুনিক সভ্যতা নগরকেন্দ্রিক, আর নগর মানেই হলো কৃত্রিম জীবনের আশ্রয়, যেখানে সবাই ভোগবিলাসে অভ্যস্ত অথবা প্রয়াসী। সেই জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, টানাপোড়েন, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এবং বাইরের জগতের সংঘর্ষ ইত্যাদি বিষয়সমূহ প্রতিফলিত হয় আধুনিক সাহিত্যে। জাপানের অন্যান্য আধুনিকতাবাদী লেখকের মতো

ইয়াসুনারি কাওয়াবাতাও সাহিত্যের স্টাইল নিয়ে পরীক্ষণ চালিয়েছিলেন। সাহিত্যজীবনের প্রথমদিকে তিনি 'নব্য উপলব্ধিবাদ'(Neo-perceptionist) গ্রুপের সদস্য ছিলেন। ঐ গ্রুপের অন্যদের মতো তিনিও ঘটনার আক্ষরিক বর্ণনায় বিশ্বাসী ছিলেন না, বরং বিশেষ কোনো ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা চিত্রায়িত করার প্রয়াস পেতেন। তিনি বিভিন্ন আধুনিক ধারণা নিয়ে কাজ করলেও মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব, যার ঢেউ তখন জাপানেও লেগেছিল, তাতে আগ্রহ দেখাননি। তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনে না, বরং আর্টের জন্য আর্ট এই মতে বিশ্বাসী ছিলেন।

৩.

শুভ্র বরফের দেশ উপন্যাসটি শেষ করতে কাওয়াবাতা মোটামুটি বারো বছর সময় নিয়েছিলেন, ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত, বই আকারে প্রকাশ ১৯৪৮ সালে। মূলত উপন্যাসটির প্রথমদিকের দুটো অংশ ছোটগল্প আকারে আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। এত দীর্ঘসময় নিলেও উপন্যাসের অন্তর্নিহিত ঐক্য সৃষ্টিতে সেটা কোনো বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি, বরং এর বিন্যাসটা ত্রুটিহীন গাণিতিক হিসাবের মতো। যেমন, শীমামুরা প্রথম ইয়োকোকে দেখে ট্রেনের কাচের জানালার 'আয়না'তে, যেখানে একটা 'জ্বলন্ত' ভূদৃশ্যের মাঝে তার মুখটা প্রতিফলিত হয়। উপন্যাসের শেষে এসে দেখা যায়, ইয়োকো জ্বলন্ত আগুনে পুড়ে সম্ভবত মারাই গিয়েছে। এভাবে ধারণার সঙ্গে ধারণার, শব্দের সঙ্গে শব্দের, চরিত্রের সঙ্গে চরিত্রের, ছবির সঙ্গে ছবির বাঁধন যেন টাইট-ফিট পোশাকের মতো। এ কারণেই কাওয়াবাতার লেখনীর মধ্যে রয়েছে সংগীতের মূর্ছনা, বিশুদ্ধ লিরিক।

জাপানের উত্তর অংশের বরফাবৃত এলাকার পটভূমিতে উপন্যাসটি লেখা। উল্লেখ্য, জাপানের অধিকাংশ স্থানে শীতকালে কমবেশি বরফ পড়লেও সাইবেরিয়া ঘেঁষা উত্তর-পশ্চিম জাপানে সবচেয়ে বেশি তুষারপাত হয়। সেখানে ঢেউ খেলানো পাহাড়শৈলীর মাঝে উপত্যকার ঢালে জনবসতি। উপন্যাসটিতে পশ্চিমা প্রভাবে কীভাবে চিরায়ত জাপান বদলে যাচ্ছে সেই দৃশ্য ধারণ করা হয়েছে। ঐ এলাকায় ততদিনে রেললাইন, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ স্থাপিত হয়েছে, সেখানে আধুনিকতার হাওয়া সবেমাত্র শুরু। তবে জীবনযাত্রা আগের মতোই পুরাতন ধাঁচের।

উপন্যাসটিতে কাওয়াবাতা লিখেছেন ত্রিভুজ প্রেমের গল্প, যেখানে টোকিওর বাসিন্দা শীমামুরা বরফের দেশে বেড়াতে এসে উষ্ণ ঝরনার গ্রামে বসবাসরত বাইজি কোমাকোর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। 'সম্পর্ক গোড়ে তোলা' কথাটা ভুল হতে পারে, কারণ শীমামুরা কোনো স্থায়ী সম্পর্কে বিশ্বাস করে না, সে ধরনের কোনো ইচ্ছা বা মনমানসিকতা তার মধ্যে নেই। টোকিওতে শীমামুরার স্ত্রী-সন্তান রয়েছে। তার নির্দিষ্ট কোনো চাকরি বা কাজ নেই, তবে উত্তরাধিকার সূত্রে যথেষ্ট সম্পত্তি অর্জন করেছে। কাজের চাপ নেই, সংসারের প্রতি দায়িত্ব নেই, অথবা দায়িত্বে অবহেলা আছে, অথচ হাতে প্রচুর টাকা। ফলাফল এই দাঁড়িয়েছে যে এক

ধরনের বাস্তবতাবর্জিত স্বপ্নবিলাসে মেতে ওঠে সে। মানুষ, সাহিত্য, নৃত্য, সবকিছুকেই সে বিচার করে ভাসাভাসা ভাবে, প্রকৃত অর্থ তার ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। একজন অলস ব্যক্তিকেও মাঝে মাঝে জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজতে হয়। সেই উদ্দেশ্যের সন্ধানেই শীমামুরা মাঝে মাঝে পাহাড়ি এলাকায় ভ্রমণে যায়। সে ভ্রমণপিয়াসী, স্ত্রী-সন্তান রেখে প্রায়শই ঘরের বাইরে অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়ে সে।

শীমামুরা কোমাকোর সঙ্গে সম্পর্ক করে মূলত মৌজ করার জন্য, তবে সেটা অবশ্যই পারিবারিক স্থিতাবস্থা বজায় রেখে—"গভীর জলে ডুব না দিয়ে কেবল হাঁটুপানিতে পা ভেজানোর পেছনে তার কারণ ছিল বইকি।" সে নিজেকে সাহিত্যসমালোচক ভাবতে পছন্দ করে, কিছু পশ্চিমা সাহিত্যকর্ম অনুবাদও করে। কিন্তু সাহিত্য সম্পর্কে তার জ্ঞান ভাসাভাসা, গভীরে প্রবেশ করতে পারে না এবং সম্ভবত চায়ও না। পশ্চিমা ব্যালে নৃত্য নিয়েও সে লেখালেখি করে, যদিও জীবনে কোনো দিন সে ব্যালে নৃত্য দেখেনি। মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একই মানসিকতা তার—"এটাও সম্ভব যে পশ্চিমা নৃত্যকে সে যে চোখে দেখেছে, হয়তো নিজের অজান্তেই মেয়েটার সঙ্গেও ঠিক তেমনই ব্যবহার করছে সে।" শীমামুরা কোমাকোর সঙ্গে মিশেছে, কিন্তু কোমাকোর প্রতি কোনো দায়িত্ব বোধ করেনি। কোমাকোর শরীরের গঠনে এবং উষ্ণতায় সে সৌন্দর্য খুঁজে বেড়িয়েছে, কিন্তু কোমাকোদের জীবন যে কতটা কঠিন সেটা সে ভাবেনি, যদি ভেবেও থাকে সে ভাবনার মধ্যেও স্বপ্নবিলাসিতা ছাড়া কোনো বাস্তবতার স্পর্শ পাওয়া যায় না।

জাপানের সমসাময়িক সামাজিক রীতি বিচারে শীমামুরার অন্য নারীতে আসক্তিকে খুব একটা অস্বাভাবিকও বলা যাবে না। কাওয়াবাতার আগের এবং তাঁর সমসাময়িক অনেক লেখকই দেখিয়েছেন পুরুষেরা একই সঙ্গে স্ত্রী-সন্তানসহ পরিবার ঠিক রেখেছে, আবার রীতিমতো ভরণপোষণ দিয়ে রক্ষিতাও পুষেছে। কাওয়াবাতার কিছুটা আগের সময়ের ঔপন্যাসিক মোরি ওগাই তাঁর *দ্য ওয়াইল্ড গিজ* (বুনোহাঁস), এমনকি কাওয়াবাতা নিজেও তাঁর আরেকটি বিখ্যাত উপন্যাস *থাউজ্যান্ড ক্রেন্স* (হাজার সারস)-এ পুরুষদের রক্ষিতার শরণাপন্ন হবার বিষয়টা তুলে এনেছেন। সেই বিচারে শীমামুরার চরিত্রে বিশেষ কোনো স্বাতন্ত্র্য না থাকলেও, তার ভেতরের সংঘাত ও সিদ্ধান্তহীনতা, তার অস্থিরতা, কোমাকোর আবেদনে নিরাসক্তভাবে হলেও তাঁর সাড়া দেয়া, এসব কিছুকেই জাপানি আধুনিকতার প্রথমদিককার লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

কোমাকো শীতল বরফের দেশের উষ্ণ ঝরনা এলাকার একজন বাইজি, যাকে জাপানি ভাষায় 'গেঈসা' বলে। তবে 'বাইজি' কথাটার মাধ্যমে 'গেঈসা' শব্দের অনুবাদটা একেবারে সঠিকভাবে হয় কি না সন্দেহ, কারণ গেঈসারা যে শুধু নাচেগানে পারদর্শী তা না, তাদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিছু বিশেষ কলা অর্জন করতে হয়, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও আচার-আচরণ সম্পর্কে কমবেশি ধারণা থাকতে

হয়। একজন শিক্ষানবিশ গেঈসাকে 'মাইকো' বলে। বলাই বাহুল্য, এই দারিদ্র্যপীড়িত এবং প্রধানত কৃষিনির্ভর পল্লি এলাকায় কোনো মেয়ে গেঈসা হয় মূলত জীবনধারণের তাগিদে, অর্থ উপার্জনের জন্য। দূর-পল্লির উষ্ণ ঝরনা এলাকার বাইজি যে শহরের বাইজিদের মতো শিল্পসচেতন হবেই তা না, অনেক ক্ষেত্রে বাইজি এবং যৌনকর্মীদের মধ্যে হয়তো খুব সামান্যই পার্থক্য থাকত। এ ধরনের একটা পরিবেশে অবস্থান করে কোমাকোর স্বতন্ত্র হয়ে ধরা দেয়াটা রীতিমতো বিস্ময়কর। সে পুরোপুরি বাইজি না হয়েও বিভিন্ন পার্টিতে ডাক পেত অথচ তার চরিত্র নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলত না।

কোমাকো বাইজি, কিন্তু তার সমস্যা হলো সে নিজেকে সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক করে তুলতে পারেনি, যাকে বলে 'প্রফেশনাল' বাইজি সে সেটা হতে পারেনি। তার মধ্যে রয়েছে এক কোমল সংবেদনশীল হৃদয়, যেটা ভালোবাসতে চায়, ভালোবাসা পেতে চায়, আবেগ-অনুভূতির শিকড় তখনও তার মধ্যে ভালোভাবেই প্রোথিত। প্রথমে শীমামুরার সঙ্গে সম্পর্ক ঘণ্টা চুক্তিতে টাকার হিসেবে শুরু হলেও কিছুদিনের মধ্যেই সে তাকে তার দেহমন সবই নিবেদন করে। শীমামুরা তার নিবেদনে সাড়া দেয় প্রথমত জৈবিক তাড়নায়, তবে সীমিত আকারে আবেগের উপস্থিতিও সেখানে লক্ষণীয়। কোমাকোর ছটফটানি সেও অনুভব করে, কিন্তু তারা দুজনেই যেটা হৃদয়ের গভীরে অনুভব করে, তাদের মধ্যে ঘটে যাওয়া সবই একটা 'নিষ্ফল প্রচেষ্টা'।

কোমাকোর মতো বাইজিরা জানে তাদের কাছে আসা পুরুষদের পারিবারিক এবং অন্যান্য সীমাবদ্ধতা আছে। মন দেয়া-নেয়ার উন্মুক্ত খেলা করার সুযোগ সেখানে সীমিত। শীমামুরা একটা রেডলাইন অতিক্রম না করে কোমাকোর সঙ্গে সম্পর্ক করে, যদিও সে সবসময় সচেতন থাকে যে আজ হোক কাল হোক এ সম্পর্কে ছেদ পড়বেই। কিন্তু কোমাকোর তো নারী মন, যেমনটি সে বলে, 'প্রকৃত ভালোবাসতে তো মেয়েরাই পারে।' সে প্রকৃতই ভালোবাসে, কোনো প্রকার প্রতিদানের আশা না করেই। শীমামুরা ডাকলেও সে আসে, না ডাকলেও আসে। কোমাকোর জীবন যেন অনেকগুলো নিষ্ফল প্রচেষ্টার সমষ্টি। সেই ষোলো বছর বয়স থেকে সে ডায়েরি লেখে, এযাবৎকাল পর্যন্ত যতগুলো বই পড়েছে তার একটা লম্বা তালিকা করে রাখে, এর আগে যক্ষ্মায় আক্রান্ত মিউজিকের ম্যামের ছেলের সঙ্গে 'সম্পর্ক' করে, সবশেষে শীমামুরার সঙ্গে প্রেমের বাঁধনে জড়িয়ে পড়ে—এসবই যেন তার নিষ্ফল প্রচেষ্টা। সেই নিষ্ফল প্রচেষ্টার পাঁকে পড়ে সে ছটফট করে, মনের অস্থিরতা নিরসনে অতিরিক্ত মদপান শুরু করে। সে এমন একজন মেয়ে যার যৎসামান্য বর্তমান থাকলেও ভবিষ্যৎ বলতে কিছুই নেই। সামনে ধূসর শূন্যতা ছাড়া আর কিছু গোচরে আসে না। যেমনটি শীমামুরা ভাবে, কোমাকোর সৌন্দর্য হলো 'ক্ষয়প্রাপ্ত সৌন্দর্য'। তবে, এতকিছুর মাঝেও কোমাকো সতেজভাবে বেঁচে থাকে, ভালোবাসার মানুষের জন্য সৌন্দর্যচর্চা করে, হাসে, কাঁদে। কোমাকো যেন

আক্ষরিক ও রূপক অর্থে জাগতিক যেকোনো কিছুর ক্ষয়িষ্ণুতার কথাই মনে করিয়ে দেয়, মনে করিয়ে দেয় সৌন্দর্য ও বিষাদ একসুতোয় গাঁথা।

শীমামুরা-কোমাকোর মান-অভিমান, আশা-হতাশা, আনন্দ-বিষাদের অমোঘ টানাপোড়েন সমৃদ্ধ সম্পর্কের মাঝে ইয়োকো কখন এসে হাজির হলো? ইয়োকোর সঙ্গে প্রথম দেখা যখন শীমামুরা দ্বিতীয়বারের জন্য কোমাকোর সঙ্গে দেখা করার জন্য উষ্ণ ঝরনার গ্রামের পথে ট্রেনের ভেতরে। তার সঙ্গে এক অসুস্থ পুরুষ, যাকে সে এমনভাবে সেবা করছিল যে তারা স্বামী-স্ত্রী বলে শীমামুরার ভ্রম হয়েছিল। পরে দেখা যায়, লোকটা মিউজিকের ম্যামের ছেলে। যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে বাঁচার আশা না থাকায় বাড়ি ফিরে আসছে, নিজ বাড়িতেই সে মরতে চায়। মজার ব্যাপার হলো কোমাকো নিজেও ঐ একই বাড়িতে থাকে। উপন্যাসে অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতো লোকটার সঙ্গে কোমাকো এবং ইয়োকোর সম্পর্কটা যে কী সেটা বেশ রহস্যাবৃত। পাঠকদের মধ্যে এই ধারণা আসে যে একটা সময়ে লোকটাকে পাবার জন্য কোমাকো ও ইয়োকোর মধ্যে হয়তো একটা প্রতিযোগিতা ছিল। সেই একই প্রতিযোগিতা শুরু হয় শীমামুরাকে ঘিরে। ট্রেনে প্রথম দেখার সময় ইয়োকোর মধুর কণ্ঠ শীমামুরাকে আকৃষ্ট করে, পরবর্তীতে সে বারবার সেই কণ্ঠের প্রতিধ্বনি শুনতে চেয়েছে। ইয়োকো কখন শীমামুরার প্রতি আকৃষ্ট হলো সেটা স্পষ্ট না। তবে এটা স্পষ্ট যে সে কোমাকোকে হিংসা করে। এবং উল্টোটাও সত্য। যখনই কোমাকো শীমামুরার কামরায় আসে, ইয়োকো নানা ছুঁতোই আশপাশে থাকে, তাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখলে তার চোখ জ্বলে। কোমাকোর কারণে সে শীমামুরার কাছে আসতে পারে না, তবে যখন শীমামুরার সঙ্গে তার কথা বলার সুযোগ হয়, তখন সে নিজের আবেগ নিঃশেষিত করে ঢেলে দেয়। তিনটি চরিত্রই যেন একটা ঘূর্ণিপাকের আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকে। হৃদয়ের গহিনে তারা তিনজনই অনুভব করে কোনো একটা বিয়োগান্তক পরিণতির মধ্যদিয়ে সব শেষ হয়ে যাবে। সবশেষে ইয়োকোর আগুনে পুড়ে মারা যাবার মাধ্যমে উপন্যাসটি শেষ হয়। আবার ইয়োকো যে আগুনে পুড়ে নিশ্চিত মারাই গিয়েছে সেটাও স্পষ্ট না, কারণ একেবারে শেষ মুহূর্তেও ইয়োকোর পায়ের দিকে সামান্য খিঁচুনি লক্ষ করা গিয়েছে। তবে আগুনের ভেতরে হেঁটে গিয়ে ইয়োকোকে কোলে তুলে আনার মাধ্যমে কোমাকোর যেন দায়মুক্তি ঘটে। যেমনটি বলা হয়েছে, "ঘুরে দাঁড়িয়ে ইয়োকোকে বুকে চেপে ধরে ফিরে আসার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালায় সে। তার মুখটা টানটান আর মরিয়া, সেটারই ঠিক নিচে ইয়োকোর অভিব্যক্তিহীন মুখটা ঝুলে আছে, যেন এটা শরীর থেকে আত্মার উড়াল দেবার মুহূর্ত। কোমাকো আপ্রাণ চেষ্টা করে এগিয়ে আসতে থাকে, যেন সে তার ত্যাগ, অথবা তার শাস্তিকে বহন করছে।"

বরফের দেশের উষ্ণ ঝরনার প্রেক্ষাপটে রচিত এ উপন্যাসের মাধ্যমে ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা উত্তরের দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রা, বিশেষ করে বাইজিদের সংগ্রামমুখর জীবনের কথা তুলে ধরেছেন। উত্তরের ভূদৃশ্য একই সঙ্গে মনোরম কিন্তু নির্জন। কোমাকো নামের মেয়েটা ভালো

কিন্তু তার জীবন নিষ্ফল। ইয়োকোর কণ্ঠ সুন্দর কিন্তু বিষাদমাখা। উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ যেন কাওয়াবাতার এই ধারণাকে প্রমাণ করে যে সুন্দর সবসময় বিষাদমাখা। এখানে সৌন্দর্য বলতে উপন্যাসে বর্ণিত কোমাকো নামের মেয়ের সৌন্দর্য, তারই প্রেমে প্রতিযোগী আরেকটা মেয়ে ইয়োকোর কণ্ঠের সৌন্দর্য, বরফঢাকা উত্তরের দেশের পাহাড়ি ভূপ্রকৃতির সৌন্দর্য, নীল আকাশ ও পরিষ্কার মহাকাশের সৌন্দর্য, জীবন উপভোগের সৌন্দর্য এবং এমনকি মৃত্যুর সৌন্দর্যের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে এ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে সৌন্দর্য সবসময় ক্ষণস্থায়ী। শুভ্র বরফের দেশে, ক্ষণস্থায়ী সুন্দরের ভুবনে শীমামুরার মতো হৃদয়হীন অল্পপ্রাণ মানুষের আগমন শুধু বিষাদের মাত্রাটাকেই বাড়িয়ে দেয়।

কাওয়াবাতা এই উপন্যাসে ঘটনাসমূহ রিপোর্ট আকারে বর্ণনা না করে বরং ইঙ্গিতে, ইন্দ্রীয়ঘন বোধের মাধ্যমে প্রকাশের যে প্রয়াস পেয়েছেন, সেখানে তাঁর বিশেষ সফলতার কারণ এই যে তিনি জাপানের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ 'হাইকু' কবিতার প্রভাবকে কাজে লাগিয়েছেন। হাইকু হলো একেবারেই কয়েক লাইনের কবিতা যেখানে শব্দের দ্যোতনার মাধ্যমে কোনো কিছুকে ইঙ্গিত করা হয়, যেটা পাঠকের মনে লম্বা সময় ধরে অনুরণিত হতে থাকে। হাতে গোনা কয়েকটি শব্দ দিয়ে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য, চাঁদ, তারা, আকাশ, সমুদ্র, অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সসীম মানুষের অবস্থান ইত্যাদি বিষয়গুলো উঠে আসে অনেকটা দার্শনিকের নিরাসক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে। ঠিক একইভাবে এই উপন্যাসে শব্দ, উপমা অথবা চিত্রকল্প এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ঘটনাগুলো যেন একেকটা ছবির মতো পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়। উপন্যাসের আপাত সাধারণ স্টাইলের ভেতর দিয়ে শব্দের শক্তিমত্তাকে প্রবাহিত করেছেন তিনি। ফলশ্রুতিতে দেখা যায়, ঘটনা এবং প্রকৃতি থেকে নেয়া চিত্রকল্প যেন পালাক্রমে একটার পর আরেকটা আসে। কখনো কখনো একটা চিত্রকল্পের ওপর আরেকটা চিত্রকল্প প্রতিস্থাপিত হয়। মৃত গুটিপোকা, দেবদারু বাগান, ঘাসফড়িং, কয়েক প্রকারের ফুল, পাহাড়, নদী এই চিত্রকল্পগুলো পাঠকের কল্পনায় আসে চলচ্চিত্রের একেকটা দৃশ্যের মতো। মানুষ ও প্রকৃতি যেন মিশে একাকার; শীত, গ্রীষ্ম, হেমন্তে প্রকৃতির রূপ বদলায়, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলায় মানুষের কর্মপরিকল্পনা ও চিন্তাভাবনা। কাওয়াবাতা যে হাইকু কবিতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ মেলে যখন আমরা দেখি উপন্যাসে বাঁশোর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। মাৎসুও বাঁশো (১৬৪৪-১৬৯৪) ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত জাপানি কবি যিনি হাইকুকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন।

সাহিত্যে জাপানের প্রথম এবং এশিয়ার দ্বিতীয় নোবেল পুরুস্কার বিজয়ী ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা এশিয়ার প্রথম নোবেল পুরুস্কার বিজয়ী সাহিত্যিক বাঙালি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেখা পেয়েছিলেন এবং তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। শুভ্র *বরফের দেশ* উপন্যাসটি তাঁর কালজয়ী সৃষ্টি, তাঁর মাস্টারপিস হিসেবে স্বীকৃত। ইংরেজিসহ অগণিত ভাষায় উপন্যাসটির অনুবাদ হয়েছে। ইংরেজিতে প্রথম

অনুবাদ হয় ১৯৫২ সালে। বাংলাভাষীদের কাছে জাপান পরিচিত সূর্যোদয়ের দেশ হিসেবে, শান্তির নীড় হিসেবে। জাপানের মানুষ এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে বাঙালিদের আগ্রহের অন্ত নেই। এই উপন্যাসে কাওয়াবাতার সাহিত্যভাবনায় আধুনিক জাপানের কোলাহলমুখর যান্ত্রিক উপস্থিতির মাঝেও চিরায়ত জাপানের পরিচয় উঠে এসেছে। এসব কারণেই এই বিখ্যাত উপন্যাসটি অনুবাদের মাধ্যমে বাংলাভাষার পাঠকদের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি।

অনুবাদটির মুখবন্ধ লিখেছেন জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট স্কুল অব হিউম্যানিটিজের স্বনামধন্য অধ্যাপক কোসুগি ছেই। পাঠকদের সুবিধার্থে তাঁর লেখা ইংরেজি মুখবন্ধের বাংলা অনুবাদ করে দিয়েছি। উপন্যাসটি অনুবাদে বিভিন্ন সময়ে ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট স্কুল অব ল্যাংগুয়েজ অ্যান্ড কালচারের এমেরিটাস প্রফেসর ইয়োশিও ইচে এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের খ্যাতিমান অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরীর পরামর্শ নিয়েছি। অনুবাদটি প্রকাশের সুযোগ করে দেয়ার জন্য কবি প্রকাশনীর সজল আহমেদকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

তারিখ :

মামুনুর রহমান
ইংরেজি বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর কোসুগি ছেই-এর মুখবন্ধ

প্রফেসর রহমান মেক্সট স্কলারশিপ নিয়ে রিসার্চ স্কলার হিসাবে ২০০৭ সালে প্রথম ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। তারপর থেকে আমাদের মধ্যে পনেরো বছরের গবেষণা সহযোগিতা চলমান রয়েছে। বছর-পরম্পরায় গড়ে ওঠা এ সম্পর্ক অসাধারণ ও মূল্যবান। প্রফেসর মামুনুর রহমানের গবেষণার বিষয়ের মধ্যে রয়েছে উত্তর-ঔপনিবেশিকতা এবং ভারত, বাংলাদেশ ও জাপানের সাহিত্য। *পোস্টকলোনিয়াল ফরমেশন* এবং *কালচারাল ফরমেশন স্টাডিজ* নামে আমাদের যে যৌথ গবেষণা প্রকল্প রয়েছে সেখানে প্রফেসর মামুনুর রহমান ২০১৭ সাল থেকে গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করছেন। আমার জ্যেষ্ঠ সহকর্মী এমেরিটাস প্রফেসর ইয়োশিও ইচে এবং ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন স্নাতকোত্তরের সঙ্গে যৌথভাবে দুটো বই প্রকাশ করেছেন তিনি।

আমি শুনে খুবই খুশি হয়েছি যে প্রফেসর রহমান সাহিত্যে প্রথম নোবেল বিজয়ী জাপানি ঔপন্যাসিক ইয়াসুনারি কাওয়াবাতার *শুভ্র বরফের দেশ* (স্নো কান্ট্রি) উপন্যাসটির বাংলা অনুবাদ সম্পন্ন করেছেন। এডওর্য়ার্ড জি. শেইনেস্টিকারের ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে উপন্যাসটির যশ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এই উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ প্রকাশের মাধ্যমে কাওয়াবাতার সাহিত্যজগৎ আরও সমৃদ্ধ হবে কারণ বাংলাভাষার পাঠকেরা আরেকটি এশিয়ান দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাসটি পাঠ ও ব্যাখা করবে। কাওয়াবাতার এই উপন্যাসে প্রধান মহিলা চরিত্রগুলোকে বিশদভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে। বাংলাভাষী মহিলা পাঠকেরা বিষয়টাকে কীভাবে বিচার করে সেটা জানার আগ্রহ রয়ে গেল।

আমি এই মুখবন্ধটা লিখছি 'সিমোযুকি'র (Shimozuki) মাসে, যার আক্ষরিক অর্থ হলো বরফের মাস, যখন শীত জেঁকে বসার অপেক্ষায় রয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য প্রফেসর রহমানকে অভিনন্দন জানাই। নিকট-ভবিষ্যতে তাঁর সঙ্গে উপন্যাসটি নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

নভেম্বর ২০২২

কোসুগি ছেই
গ্রাজুয়েট স্কুল অব হিউম্যানিটিজ
ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান

প্রথম পত্র

ট্রেনটা বিশাল সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে বরফের দেশে বেরিয়ে আসে। রাতের আকাশের নিচে শায়িত পৃথিবীকে শুভ্র দেখায়। একটা সিগন্যাল স্টপেজে এসে থামে এটা।

শীমামুরার সামনের সিটে বসে থাকা মেয়েটা উঠে এসে পাশের জানালা খুলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে কনকনে বরফ-ঠাণ্ডা বাতাস। মেয়েটা জানালার বাইরে বেশ খানিকটা ঝুঁকে পড়ে স্টেশনমাস্টারকে এমনভাবে ডাকে যেন সে অনেক দূরে রয়েছে।

স্টেশনমাস্টার বরফের ওপর দিয়ে খুব ধীর লয়ে হেঁটে আসে, হাতে একটা বাতি ধরা। মুখটা মাফলারের মধ্যে নাক বরাবর ডুবানো, টুপির আলগা ঝুলে থাকা অংশ দিয়ে কান পর্যন্ত ঢাকা।

কী শীত রে বাবা, শীমামুরা ভাবে। এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ব্যারাকের মতো নিচু ভবনগুলো একবারে পাহাড়ের বরফাচ্ছন্ন ঢাল পর্যন্ত বিস্তৃত, সম্ভবত রেলওয়ে ডরমিটরি হবে। বরফের শুভ্রতা সেগুলোর কাছে পৌঁছানোর আগেই অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

"আপনি কেমন আছেন?" মেয়েটি বলে ওঠে। "আমি ইয়োকো।"

"ইয়োকো? বাড়ি ফিরছেন? আবার বেদম শীত পড়া শুরু করেছে।"

"আমার ভাই কাজের খোঁজে এখানে এসেছে। ওর জন্য আপনি যা করেছেন না! অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে।"

"তবে ওর কাছে জায়গাটা খুব নির্জন লাগবে। যুবক ছেলেপেলেদের জায়গা এটা না।"

"সত্যি বলতে কী, ও একটা শিশুই রয়ে গেছে। আপনি ওকে একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নেবেন তো?"

"হ্যাঁ, তা তো বটেই। তবে সে খুব ভালো করছে। এখন থেকে বরফ আমাদেরকে পাগলের মতো ব্যস্ত করে রাখবে। গত বছর এতটাই তুষারপাত হয়েছিল যে ট্রেনগুলো সবসময়ই বরফের ধসে আটকে পড়ত, তখন প্যাসেঞ্জারদের জন্য রান্নাবান্না করতে সারা শহর ব্যস্ত হয়ে পড়ত।"

"ওর শীতের পোশাকের দিকে একটু খেয়াল রাখবেন। আমার ভাই চিঠিতে জানিয়েছিল যে ও তখনও একটা সোয়েটার পর্যন্ত পরা শুরু করেনি।"

"আমি তো গায়ে চার চারটে পোশাক না চড়ালে গরমই হই না। যুবকেরা শীত এলেই মদ খাওয়া শুরু করে। তারপর ঠাণ্ডায় কুপোকাত হয়ে ঐখানে বিছানায় পড়ে থাকে।" সে তার হাতের বাতি দিয়ে নিচু ভবনগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল।

"আমার ভাইও কি মদ খায়?"

"আমি অবশ্য এ সম্পর্কে কিছু জানি না।"

"আপনি তো এখন বাড়ি ফিরছেন, তাই না?"

"ছোট একটা দুর্ঘটনায় পড়েছিলাম, ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি।"

"আপনাকে কিন্তু আরও সতর্ক থাকতে হবে।"

যেন এই শীতল কথোপকথনকে সংক্ষিপ্ত করার জন্যই স্টেশনমাস্টার ঘুরে দাঁড়ায়। তার শরীরে কিমোনোর ওপর একটা ওভারকোট চড়ানো। "আপনি নিজেও সাবধান থাকবেন," সে মাথাটা ঘুরিয়ে বলে।

"আমার ভাই কি এখন এখানে আছে?" ইয়োকো বরফাচ্ছাদিত প্লাটফর্মের দিকে দৃষ্টি দেয়। "খেয়াল রাখবেন সে যেন ভালোভাবে চলাফেরা করে।" কণ্ঠস্বরটা এতটাই সুন্দর যে সেটা একটা বিষাদের সুর নিয়ে কানে বাজে। সেই স্বরের উচ্চনাদী অনুরণনের প্রতিধ্বনি যেন তুষারঘন রাত ভেদ করে ফিরে ফিরে আসে। ট্রেনটা স্টেশন ছেড়ে চলে যাবার সময়ও মেয়েটা জানালা দিয়ে মুখ বের করে রেখেছে। "আমার ভাইকে বলবেন, ছুটিতে যেন বাড়ি আসে," রেললাইনের সমান্তরালে হাঁটতে থাকা স্টেশনমাস্টারকে উদ্দেশ করে সে বলে।

"ঠিক আছে, আমি তাকে বলব," লোকটা জবাব দেয়।

ইয়োকো জানালাটা বন্ধ করে, তারপর ঠাণ্ডায় লাল হয়ে যাওয়া গালটা হাত দিয়ে ডলতে থাকে।

এই বর্ডার রেঞ্জে ভারী বরফ সরানোর জন্য তিনটা বরফ ঠ্যালার যান প্রস্তুত রাখা হয়েছে। সুড়ঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ প্রবেশদ্বারে তুষারধসের সংকেত দেবার বৈদ্যুতিক যন্ত্র বসানো। বরফ পরিষ্কার করার জন্য পাঁচ হাজার কর্মী তো প্রস্তুত আছেই, এছাড়াও প্রয়োজন হলে অগ্নিনির্বাপক বিভাগের দুই হাজার স্বেচ্ছাসেবককে কাজে লাগানো যাবে।

ইয়োকোর ভাই এই সিগন্যাল স্টপেই কাজ করছে, এমনও হতে পারে সে অচিরেই বরফের নিচে ঢেকে যাবে—এই ভাবনাটাই কেন যেন শীমামুরার কাছে মেয়েটাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।

"মেয়েটা"—তার আচরণে এমন কিছু আছে যা দেখে তাকে অবিবাহিত মনে হয়। অবশ্য পাশে বসা পুরুষমানুষটার সঙ্গে তার কী ধরনের সম্পর্ক সেটা নিশ্চিত হবার কোনো উপায় শীমামুরার ছিল না। তারা দম্পতির মতোই আচরণ করছে। সন্দেহ নেই যে লোকটা অসুস্থ, আর রোগশোক একজন পুরুষ এবং মেয়ে মানুষের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে দেয়। সেবা-শুশ্রূষার ব্যগ্রতা যতই বেড়ে গেল, ততই তাদেরকে স্বামী-স্ত্রী মনে হলো। নিজের চেয়ে অনেক বেশি বয়সের একজন